

# হত্যা নয় জীবন বাঁচাও

তুষার আবদুল্লাহ



একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

হত্যা নয় জীবন বাঁচাও

তুষার আবদুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অধ্যয়ন : ১২১

প্রকাশক

তাসনোভা আদিবা শেঁজুতি

অধ্যয়ন প্রকাশনী

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

ফ্রন্ট এম

বর্ণ বিন্যাস

অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ

একতা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ২৭০.০০

---

**Hotta Noy Jibon Bachao**

**By : Tushar Abdullah**

**First Published : February 2023 by Tasnova Adiba Shanjute**

**Addhayan Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100**

**Price : 270.00 \$8**

**ISBN : 978-984-97259-2-3**

উৎসর্গ

‘আপনি’

যিনি সহকর্মীদের মানসিক অবসাদে রাখেন।

আপনার মানসিক সুস্থতা প্রত্যাশায়...

## আহবান

কখন ‘শূন্য’ হয়ে যাই? কিংবা এই গোলক কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোনো দূর দিগন্তেও কাউকে দেখতে পাই না। যে হাত বাড়িয়ে দেবে। বলবে, আছি। থাকো তুমি। এই পৃথিবী সত্যি তোমাকেই চায়। যে ছিল পাশে, বলেছিল যে আসবে পাশে। যারা বলেছে— তুমি ব্যর্থ, ওরা সত্য নয়। সত্য আমি। আমার স্বপ্ন সত্য। কুয়াশার দেয়াল দেখেই থেমে যাই। দেয়াল ভাঙতে চাই না। ছুঁতে যেতেও ভয় পাই। নিজেকে একলা ভেবে। কারণ ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার শক্তি। সম্পর্কের মানুষ, কাজের জায়গার মানুষ, জ্ঞাত-অজ্ঞাতরা ভুলিয়ে দেয় আমাকেই। নিজের কাছেই অসহায়, একলা ও শূন্য হয়ে উঠি। লিখে ফেলি শেষ ইশতেহার- প্রয়োজন নেই। পরিবার, সমাজ এবং এই মর্ত্যে আমার। তখনই এগিয়ে যাওয়া নিজেকে হত্যার। অচল পয়সার মতো মৃত্যুর কাছে নিজেকে ছুড়ে দেওয়া।

জীবনের খুচরো দুঃখ, অপ্রাপ্তি, হাওয়াই মিঠাই হয়ে স্বপ্ন উবে যাওয়া, শারীরিক যন্ত্রণা, লোভ, ভোগের অন্ধের গরমিল ধীরে ধীরে অবসাদে নিমজ্জিত করে দেয়। তখন আমরা ভুলে যাই জীবনে ভেসে থাকার জানা সাঁতারটিও। আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে মৃত্যু। যে মৃত্যুর কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বটিও কাঁধে তুলে নেওয়া। আত্মহনন, আত্মহত্যা যেভাবেই বলি না কেন, এই প্রক্রিয়াটি জীবনের ভাগশেষ হতে পারে না। জীবনের গণিত খুব সাধারণ-লড়াই। হুম, বাঁচো লড়াই করে। নিজের জন্য। অবশ্যই পৃথিবীর কাছে প্রত্যেক প্রাণের শেষ দীর্ঘশ্বাসটুকুও অমূল্য এবং জীবনের সত্য ব্যবস্থাপত্র-শূন্য থেকে জীবনের পুনঃযাত্রা।

এই গ্রন্থে আমরা এই সত্যটিই নিজেদের আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি। অধ্যয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা জীবন বাঁচানোর আহবান, পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

তুষার আবদুল্লাহ

পূর্বাচল

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

tushar.abdullah@gmail.com

## সূচি

|   |    |
|---|----|
| দুঃখিত আবু মহসিন                          | ১১ |
| আমরা কেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি?               | ১৬ |
| নিঃসঙ্গতা আর হতাশা— একটা জীবন শেষ করে দিল | ২০ |
| মাদক : অবসাদের ঐন্দো জলাশয়               | ৩৮ |
| অভিমান কি হারিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস?      | ৪১ |
| রোজগারের গোলমালে বিপন্ন জীবন              | ৪৫ |
| যত্নের স্পর্শ থাকুক রোগ যন্ত্রণায়...     | ৪৮ |
| সাক্ষ্যে কেন অবসাদের অসুখ?                | ৫০ |
| গোলমেলে পরিবারের ঝুঁকি                    | ৫৩ |
| শিক্ষার্থীদের মনের অসুখ                   | ৫৬ |
| গণমাধ্যমের অবসাদ                          | ৬০ |
| ভালোবেসে কেন নিজেকে হারাই?                | ৬৩ |
| প্রলোভনের ফাঁদ                            | ৬৫ |
| বিশ্বাসের বিষে...                         | ৬৬ |
| কয়েকটি বিষণ্ণ বিদায়                     | ৭২ |
| মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়                | ৭৬ |
| করোনাকালের বিষাদ                          | ৮১ |
| অতএব জীবনের ইশতেহার                       | ৮৩ |

## দুঃখিত আবু মহসিন

চলে গেলেন তিনি জীবনে টিল ছুড়ে। আমাদের জীবন। আছি যারা আমরা এখনো পৃথিবীতে, আছি জীবনে। তার ছুড়ে দেওয়া টিলে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। যখন তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল কথাগুলো আমার। অভিযোগ, অনুযোগের তীর এসে বিঁধছে আমার বুকে। যখন হাহাকার ভরে উঠছিল হৃদয়, শূন্যতায় বা কাউকে হারানোর ভয়ে, তখন আমাদের সামনে এসে হয়তো ভেসে বেড়াচ্ছিল কোনো প্রিয়জনের মুখ। সব মুখ সেরে এসে কখন যে নিজের মুখটিই এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল, মোটেই টের পাইনি। কারণ আমরা যেন তখন প্রত্যেকের জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাব নিয়ে বসেছিলাম। জীবনের প্রাপ্তিযোগ ও অবচয়ের ভাগশেষ দেখতো যাব যখনই তখনই পিস্তলের আত্মচিহ্নকারে বর্তমানে ফিরি। দেখি চলে গেছেন তিনি জীবন থেকে। আবু মহসিন খান, ৫৮ বছর বয়সি ব্যবসায়ী। তার ফেইসবুক লাইভ হঠাৎ করেই চোখে পড়ে। আমরা নিজেরাই তখন তাড়ার মধ্যে আছি। সংসার, কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে আমরা দৌড়ে যাচ্ছি নিরন্তর। মহসিন খানও এমন জীবন যাপন করে গেছেন। ফেইসবুক লাইভে তিনি যখন বলে যাচ্ছিলেন, জীবনের উপলব্ধি, তার অভিজ্ঞতা দিয়ে করে যাচ্ছিলেন ময়না তদন্ত, তখনও বুঝতে পারিনি আত্মঘাতী হবেন। বাঁক ঘুরছিল তার কথার। কিন্তু প্রতি বাঁকেই মনে হচ্ছিল তিনি কাউকে অভিযুক্ত করছেন, পরিচিতদের বড়ো একটি অংশের বিরুদ্ধে অভিমান জমে আছে। নিজের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের কাছ থেকে আলাদা থাকা- মানুষটি হয়তো জমে থাকা কালো মেঘের বৃষ্টি ঝরাচ্ছেন। জানিয়ে দিচ্ছেন চারপাশের প্রতি তার আত্মহীনতার কথা। একবারও ভাবতে পারিনি তিনি ফেইসবুক লাইভেই থামিয়ে দেবেন জীবন। এমনকি তিনি যখন পিস্তল হাতে তুলে নিলেন; দেখালেন লাইসেন্স। তখনও মনে হচ্ছিল, তিনি হুমকি দিচ্ছেন তাদেরকে যারা তাকে করেছে বঞ্চিত, প্রতারিত হয়েছেন যাদের কাছ থেকে। তিনি যখন ফাঁকা গুলি ছুড়লেন, ভাবলাম এটি চূড়ান্ত হুমকি।

এই হুমকি দিয়েই হয়তো শেষ করবেন ফেইসবুক লাইভ। নাহ, আবু মহসিন খান দ্বিতীয় গুলিটির লক্ষ্য স্থির করলেন তার মস্তকে। অতঃপর অভিমান, অবসাদের সমাপ্তি। আমরা যারা ফেইসবুক লাইভের দর্শক ছিলাম, মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানে ফিরে এসে দেখি টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ হয়তো আবু মহসিন খানকে বলতে চেয়েছিল— থামুন, থামো। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। যখন বলার দরকার ছিল, তখন কেউ এসে বলেনি— “ভালো আছো তো?” ফেইসবুক লাইভে জীবনের জবানবন্দিতে আবু মহসিন জানিয়ে গেছেন— ‘আমি মহসিন, ঢাকায় থাকি। বয়স ৫৮ বছর। কোনো এক সময় আমার ভালো ব্যবসা ছিল। আমি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত। তাই আমার এখন ব্যবসা বা কোনো কিছু নেই। আমার ভিডিও লাইভে আসার উদ্দেশ্য হলো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেকের মাঝে শেয়ার করা, যা সবাই জানতে পারবে ও সবাই সাবধান হতে পারবে। গত ৩০ তারিখ (জানুয়ারি, ২০২২) আমার খালা মারা যান। ওনার সবই আছে, একটি ছেলে আমেরিকায় থাকে। অথচ মা মারা গেল, কিন্তু ছেলে দেশে আসল না। এটা আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে। আজ আমার আরেকজন খালা মারা গেছেন। তারও একটা ছেলে আমেরিকায় ছিল। তার তিনটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। তারা বাংলাদেশে আছেন। তার দাফন কাফনের কাজ সম্পন্ন করছেন তারা। সেদিক দিয়ে বলব এই খালা অনেক লাকি। আমার একটামাত্র ছেলে। সে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। আমি আমার বাসায় সম্পূর্ণ একা থাকি। খালা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার ভেতরে ভয় ঢুকে গেছে। আমি যদি আমার বাসায় মরে পড়ে থাকি, আমার মনে হয় না এক সপ্তাহেও কেউ জানতে পারবে। আমরা যা কিছু করি সবই পরিবার ও সন্তানের জন্য। একবার চিন্তা করে দেখেন, নিজের আয় করা অর্থের ২০ শতাংশও নিজের জন্য ব্যয় করেন না। করোনা শুরুর আগে থেকে আমি বাংলাদেশে আছি। একা থাকা যে কী কষ্ট, তা যারা একা থাকেন তারাই জানেন। আমার আর পৃথিবীর প্রতি, পৃথিবীর মানুষের প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই। কারণ যাদের জন্য আমি বেশি করেছি, তাদের কাছ থেকেই আমি প্রতারিত হয়েছি। আমার এক বন্ধু ছিল বাবুল, আমি নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছি। সে আমার প্রায় ২৩ থেকে ২৫ লাখ টাকা মেরে দিয়েছে। এভাবে আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে ৫ কোটি ২০ লাখ টাকার মতো পাই। সর্বশেষ আমি নোবেল নামে একজনকে বিশ্বাস করি। যাকে আমি মিনারেল ওয়াটার প্যান্টের দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু দুই বছরেও সেই প্যান্টের যন্ত্র সে কিনেনি। পরে তার কাছে টাকা ফেরত চাইলে ঝগড়া হয়, এরপর সে দুই দফায় ১

লাখ ২০ হাজার টাকা দেয়। বাকি টাকা সে আমাকে দিচ্ছে না। মানুষ কেন এত লোভী হয়’ মানুষ কেন অন্যের টাকা ছলচাতুরী করে নিয়ে যায়? আমি তো এ পর্যন্ত কারও টাকা নিইনি। আমি তো পারলে মানুষের উপকার করেছি, না পারলে মানুষের আশপাশেও যাইনি। আসলে আরেকটা জিনিস দেখলাম যে, পৃথিবীতে আপনিই আপনার। ছেলে বলেন, মেয়ে বলেন, স্ত্রী বলেন— কেউই আপনার নয়। কারণ, আজ আপনি যেভাবে হয়তো আপনার ফ্যামিলিকে মেইনটেন করছেন, কাল যদি আপনি মেইনটেন করতে না পারেন, তখনই দেখা যাবে আপনার ওয়াইফের সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব হবে, আপনার ছেলে বা মেয়ে আপনাকে পছন্দ করছে না। এগুলো কেন করে? ফ্যামিলির লোকজন কেন বুঝতে চায় না? আগে ওয়াইফের বুঝতে হবে। যখন বিয়ে হয় ২৪, ২৫ বা ৩০ বছরের একটা ছেলে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে পারে, উপার্জন করতে পারে, পরবর্তী সময়ে তো সে সেটা পারে না। তার বয়স হয়; সে পরিশ্রম কম করতে পারে; উপার্জন কমে যায়। এগুলো সব মিলিয়ে আসলে... অনেকদিন ধরেই আমি মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত। এখন জীবনে প্রতারিত হতে হতে...। তোমরা সবাই জানো আমার বাবা পর্যন্ত আমার সম্পত্তিটা ঠিকমতো বুঝিয়ে দেয়নি; টাকা-পয়সা দেয়নি। যতটুকু করেছি, নিজের চেষ্টায় করেছি। আসলে নিজের ওপর নিজের এতটাই বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে, পৃথিবীতে এখন আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি জানি, আমি যদি এখন সুইসাইড করি বা মরে পড়েও থাকি, আমি যদি ফেইসবুক লাইভে না যাই, তা হলে কেউ জানবেও না। হয়তো অনেকদিন পর সেটা জানবে। যাই হোক, অনেক কিছু বলার ছিল, ভেতরে অনেক কষ্ট। সবাই বলে, সবার সাথে শেয়ার করো। তারপরও যারা হয়তো দেখছেন, অনেকেই আমার আত্মীয় আছেন। আপনাদের কারও সাথে কোনো অন্যায় করে থাকি, ভুল করে থাকি, ক্ষমা করে দেবেন। সন্তানদের বোঝা উচিত যে, তার বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাফোর্ড করতে পারে... প্রকৃত বাবারা চেষ্টা করে সন্তানদের সেভাবে মানুষ করার জন্য। বাবারা না খেয়েও সন্তানদের খাওয়ানোর চেষ্টা করে; পরিবারকে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু, পরিবার অনেক সময় অনেক কিছু বুঝতে চায় না। কেন বুঝতে চায় না, কেন বুঝে না এগুলো... আসলে... নিজেকে আর মানিয়ে নিতে পারলাম না। একা থাকা যে কী কষ্ট, যারা একা থাকে, তারাই একমাত্র বলতে পারে বা বুঝে। আমার আসলে এখন আর পৃথিবীর প্রতি, মানুষের প্রতি...। যারা দেখছেন, এটাই আপনাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সবার সাথে। সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আমি যেটা দিয়ে সুইসাইড করার চিন্তা করছি,

এটা বেআইনি কোনো কিছু দিয়ে নয়। (লাইসেন্স দেখিয়ে) এটা হলো আমার পিস্তলের লাইসেন্স এবং এক বছরের রিনিউ করা আছে। আমি এ মুহূর্তে এখন চলে যাব। আত্মীয়স্বজন যারা আছ, তারা চেষ্টা করো আমাকে... যেহেতু বাবাও জায়গাটা দেয়নি, তাই পারিবারিক কবরস্থানে আমাকে দাফন করো না। আমাকে মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধে যে একটা কবরস্থান হয়েছে, আমাকে ওখানে দাফন করে দিও। এটা আমার জন্য ভালো হবে। পৃথিবীটা খুব সুন্দর, সবাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। পৃথিবী ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। তারপরেও চলে যেতে হয়। হয়তো আমি দুদিন পরে যেতাম, দুদিন আগে যাচ্ছি। সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিও, প্লিজ। তিনা আর নিশানকে বলব— তোমরা একটা ভাই, একটা বোন। তোমরা মিলেমিশে চলো। একে অন্যের খোঁজ-খবর নিও। আর, বাবা হিসেবে আমাকে ক্ষমা করে দিও। ভালো থেকো”

২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ রাত সাড়ে নটায় তিনি জীবন ছেড়ে চলে যান। মহসিন খান ক্যাসারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডিতে নিজের ফ্ল্যাটে থাকতেন। স্ত্রী ছেলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেন। মেয়ে স্বামীর সঙ্গে আলাদা বাড়িতে থাকেন ঢাকাতেই। ব্যবসা ও জীবনের নানা লোকসানের পাশাপাশি নিঃসঙ্গতা ও অবসাদে ভুগছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে মহসিন পুরোপুরি একাকী নিজের ওই ফ্ল্যাটে থাকছিলেন। নিজেই রান্নাবান্না করতেন। কখনো কখনো বাইরে থেকে খাবার কিনে আনতেন। বাসায় কোনো গৃহকর্মী ছিল না। ছেলে ও স্ত্রীর কাছে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করেও ভিসা জটিলতার কারণে ব্যর্থ হন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েও সফল হননি ক্যাসার আক্রান্ত মহসিন। তারই পরিণতি আত্মহত্যা। এমনটাই তাত্ক্ষণিকভাবে পরিবার ও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে গিয়ে আবু মহসিন খানের বাড়ি থেকে একটি ‘সুইসাইড নোট’ও উদ্ধার করে। যেখানে তিনি বলে গেছেন— “ব্যবসায় ধস নেমে যাওয়ায় আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমার সঙ্গে অনেকের লেনদেন ছিল। কিন্তু তারা টাকা দেয়নি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।”

আবু মহসিন খানের লাইভে আত্মহত্যার ভিডিওটি মুহূর্তেই অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় তার আত্মঘাতী হবার কারণ নিয়ে ফেইসবুক বা অবয়ব দুনিয়ার বাসিন্দাদের বিশ্লেষণ। বাসিন্দারা আর্বিভূত হন মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শক ও সমাজ বিশ্লেষকরূপে।

আমরা যদি সেই রাত থেকে অবয়বপত্রের কয়েকজন নাগরিকের মন্তব্য দেখে নেই: মোস্তফা ইমদাদ বাচ্চু বলছেন— এর চাইতেও মর্মান্তিক হাজারো ভয়ানক ঘটনা, আমাদের চারপাশে বিভিন্ন কারণে ধামাচাপা পড়ে থাকে। ঘটনার ভেতরের ঘটনাগুলো মানুষ জানলে অবাক হওয়ার অনুভূতিটাও হারিয়ে ফেলবে! তবে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মাধ্যমে সত্য একদিন ঠিকই বেরিয়ে আসে কিন্তু তখন আফসোস আর মুখরোচক গল্প করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না! অদ্ভুত এক সমাজে বাস করছি আমরা। হালাল কাজকে নিয়ে ট্রল করি; হারাম কাজের নিন্দা করি না। শেষ বিচারের দিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই বিচার করবেন সবার। তিনিই বলেছেন আত্মহত্যা হারাম। সমাজ থেকে সঠিক শিক্ষাটা আস্তে আস্তে যেন উঠে যাচ্ছে। এটা কীসের আলামত?

মোহাম্মদ সরওয়ার হোসেন লিখেন ফেইসবুক লাইভে আত্মহত্যা এবং নিজের দেশে ফেরা সম্পর্কে।

গতকাল ঘুমাতে যাব— এমন সময় ফেইসবুক লাইভে একজনের আত্মহত্যা করার ঘটনা জানলাম। ভিডিও দেখলাম। উনার জন্য কোনো মায়া হয়নি, আফসোস হয়েছে। যতই কালেমা পড়ুক, আত্মহত্যা মহাপাপ। এজন্য আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তাকে শাস্তি পেতে হবে। তিনি মৃত্যুর আগে বড়ো অন্যায় করে গেছেন নিজের শরীরের সাথে (যেটা আল্লাহ আমানত হিসেবে রেখেছেন) এবং অন্যকে লাইভে এসে আত্মহত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এটা স্পষ্ট হওয়া জরুরি মনে করি।

## আমরা কেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি?

শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য। যদিও মনে হয়, আমি এত টাকা কামাই করছি পরিবারের জন্য, এতগুলো বাড়ি করছি সন্তানদের জন্য— এগুলো মিথ্যা কথা; এগুলো মূলত নিজের জন্যই আমরা করে থাকি। সন্তান পরিবার ইস্যুটি জাস্ট নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বলে থাকি। নিজেকে গভীরভাবে প্রশ্ন করলে এর জবাব পাওয়া যাবে। সম্পর্ক তৈরিতে, উন্নয়নে অর্থ বা বস্তুগত বেশি কিছু প্রয়োজন পড়ে না।

প্রবাসী জীবনে খুব একাকিত্ব অনুভব করতাম। এজন্য নিজের একটা উক্তি প্রায়ই অনুভব করতাম— “Feeling alone in a ocean of people.” অন্যান্য সবার মতো বিনোদন, পার্টি, গেট-টুগেদার (যেমন: ঘনঘন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ) করে সময় কাটাতে আগ্রহ আসেনি কখনো। সবার যে এক ধাঁচের চিন্তা করতে হবে তা নয়। হয়তো এটাই আমার সহজাত বৈশিষ্ট্য। সেই একাকিত্ব কাটাতে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করতাম, বিশ্বের বিভিন্ন কিছু জানার এবং বোঝার চেষ্টা করতাম।

প্রবাসকালীন সময়ে দেশ থেকে ফেরার সময় প্রচণ্ড খারাপ লাগত— আব্বা, আম্মার চেহারার দিকে তাকাতাম না। প্রবাসে প্রায় প্রতিদিনই নিজেকে প্রশ্ন করতাম— কেন এখানে? ভালো খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানোই কি জীবনের উদ্দেশ্য? সবকিছু রেখেই তো কবরে চলে যেতে হবে। মাত্র কয়েক বছর লাইফের জন্য এত প্রিপারেশন, এত আকাঙ্ক্ষা? এসব প্রশ্নে রীতিমত নিজের সাথে যুদ্ধ হতো।

অবশেষে দেশে ফেরা হলো। দেশে অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হলো। দেশে বাস করা রিঙ্কিও, কেননা মন খুলে কথা বলা যায় না। রাজনীতিবিদরা এই শাস্তি কেড়ে নিয়েছে। এতকিছুর পরও তৃপ্তি রয়েছে।

এখানে মানুষের সাথে মেশার সুযোগ রয়েছে। অন্যের কষ্টে ভাগীদার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রবাসের অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এইটা অনুধাবনে আসত না। এগুলোকে নিয়ামত হিসেবে অনুধাবন করা কঠিন মনে হতো।

ছোটবেলার একটি স্বপ্নপূরণ হয়েছে। আব্বার মৃত্যুর সময় আল্লাহর ইচ্ছায় পাশে ছিলাম পরিবার নিয়ে। স্বপরিবারে বেড়াতে গিয়ে সুস্থ আব্বা কালিমা পড়তে